সমকাল

তারিখ 19 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

যতই পড়িবে... ততই কাঁদিবে

সময়ের কথা | অজয় দাশগুপ্ত

সাংবাদিক

বে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষমতা হারাচ্ছে পরিচালনা কমিটি– ১৫ অক্টোবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছিল এ খবর। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে এবং সারাদেশের জন্য তারা শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেবে। এর পর উপজেলাভিত্তিক একটি তালিকা তৈরি হবে। কোনো স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ করতে চাইলে এ তালিকা থেকে নিয়োগ দিতে হবে।

প্রথম আলো ১৩ অক্টোবর 'বাংলাদেশে স্বল্প শিক্ষিতরা বেশি কাজ পান' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও 'বিশ্ব যুব কর্মসংস্থান প্রবণতা-২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– প্রতি একশ জন উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যে ২৬ জন বেকার। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের ১২ শতাংশ বেকার। আর প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কিংবা লেখাপড়ার সুযোগ মেলেনি, এমন নারী-পুরুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৫ শতাংশ। এ তথ্যে স্পষ্ট বার্তা– যতই পড়বে, ততই বেকারত্বের শঙ্কা বেশি। কম পড়, কম জানো– তাহলে কাজের সম্ভাবনা বেশি। তবে এ প্রতিবেদনে কম পড়াশোনা শেষে কাজ পেলে যে বেতনও কম– সেটা বলা হয়নি।

এক সময়ে প্রবাদ ছিল– 'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে– মৎস্য মারিবে খাইবে সুখে।' এটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা প্রবাদ। যারা পড়তে চাইত না, তাদের উদ্দেশ করেই এর ব্যবহার ছিল। স্কুলের শিক্ষকরা ক্লাস ফাঁকি দিতে উৎসাহী কিংবা পড়াশোনায় অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি এমন তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতেন। একদা মাছ ধরা তুচ্ছ পেশা হিসেবে চিহ্নিত হতো। যেসব অভিজাত পরিবারের সদস্য ধানমণ্ডি লেকে বড়শি ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্যের পরীক্ষা দেন; সেসব পৌখিন মাছশিকারিকে নিশ্চয়ই এ দলে ফেলা হয়নি। জেলে-জিয়ানি এবং এ ধরনের পরিচয় ছিল, তাদেরই এভাবে ব্যঙ্গ করা হতো। কিন্তু যুগ বদলেছে। এখন মাছ চাষ করে অনেকে রীতিমতো ধনী। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের মাছের বিস্তর চাহিদা। মাছের খামার গড়ে তুললে সরকার থেকে শুল্ককর মওকুফ মেলে। এ কারণে অনেক রাজনীতিকও আয়ের উৎস হিসেবে মাছের খামারের মালিকানা দেখান।

আবার এই রাজনীতিকদের কারণেই স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগে চালু হয়েছে সীমাহীন দুর্নীতি। সোজা কথায়– টাকার খেলা। বাংলাদেশে যেসব খাতে ভালো কাজ হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে শিক্ষা। সরকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দিচ্ছে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দিচ্ছে। স্কুলের ভবন নির্মাণ করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য দিচ্ছে। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে প্রতি মাসে বৃত্তি দিচ্ছে। এর ফল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর যতটা পাওয়ার কথা, ততটা মিলছে না। এর কারণও আমাদের জানা– দুর্নীতি। প্রতিটি খাতে দুর্নীতি। এটা ঠিক যে, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণেই এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অন্তত পাঁচ কোটি। বহু বছর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় থাকা দেশটিতে মোট লোকসংখ্যার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ ছাত্রছাত্রী– এ অর্জন নিঃসন্দেহে গর্বের। এখন চ্যালেঞ্জ মান বাড়ানোর। আর এ ক্ষেত্রেই অন্যতম প্রধান বাধা দুর্নীতি। শিক্ষামন্ত্রী ঠিকই ধরেছেন– ম্যানেজিং কমিটির হাতে ক্ষমতা থাকলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়। অষ্টম পে স্কেল চালু হওয়ার পর মাধ্যমিক স্কুলের একজন নতুন শিক্ষক ১৫ হাজার থেকে ১৬ হাজার টাকা বেতন পাবেন। এ টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের, চাকরি করতে উৎসাহ বোধ করার কথা নয়। যারা জ্ঞানের আলো বিতরণকে পেশা হিসেবে বেছে নেবেন, তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু এই মার্কেট ইকোনমির যুগে তেমন ক'জনকে পাওয়া যাবে? আর তেমন আগ্রহী তরুণ-তরুণী থাকলেও কি ম্যানেজিং কমিটি তাদের স্কুল-কলেজে জয়েন করতে দেবে? সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব কি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের সাদরে বরণ করে নেবেন? অষ্টম পে স্কেল সরকারি প্রশাসনের পদে নতুন যারা নিয়োগ পাবে, তাদের জন্য ভালো সুবিধা দিয়েছে। মেধাবী না হলে বিসিএস ক্যাডারের পরীক্ষায় পাস করা যায় না– এটা নিয়ে দ্বিমত করা উচিত নয়। তদবির-সুপারিশের পর্যায়ে যেতে অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। শেষ ধাপ মৌখিকে হয়তো কেউ কেউ আনুকূল্য পেতে পারে। একই ধরনের মেধাবীদের নিয়ে আসা দরকার স্কুল-কলেজের শিক্ষক হিসেবে। সে জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা দিতে হবে। সবটা সরকার দিতে পারলে ভালো। না পারলে সচ্ছল অভিভাবকদের কাছ থেকে অর্থ নিতে হবে। যারা এ অর্থ দেবেন, তারা প্রথমেই নিশ্চিত হতে চাইবেন– যোগ্য লোকদের হাতে রয়েছে স্কুল-কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব। এ অর্থ যদি নয়-ছয় হয়, তাহলে কেন তারা সেটা দেবেন?

আমি শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত এক পদস্থ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম– স্কুল ও কলেজে যে এত অনিয়ম হয়, তার তদন্ত হয় কি-না। তিনি অকপটে স্বীকার করেন– দুর্নীতির তদন্তের নামে আরেক ধরনের দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়। যারা তদন্তে যান, তাদের অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলেই ঝামেলা চুকে যায়। যদি তদন্ত কমিটির সদস্যরা সেটা করতে রাজি না থাকেন, তাহলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের রোষানলে পড়ার প্রবল শঙ্কা থাকে।

একজন প্রধান শিক্ষক জানালেন, সপ্তম বেতন স্কেল চালু থাকার সময় নতুন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে (বেতন ছিল মাসে ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক থেকে দুই লাখ টাকা ঘুষ দিতে হতো। এখন বেতন হবে দ্বিগুণ। ঘুষের রেটও একই হারে বাড়বে। কমিশনের মাধ্যমে পরীক্ষা হবে এবং উপজেলাভিত্তিক তালিকা থেকেই নিয়োগ দিতে হবে– এমন যুক্তি দিই তাকে। এর উত্তরে ভুক্তভোগী একাধিক প্রধান শিক্ষক বলেন, 'বুদ্ধি থাকলে ঢেঁউ গুণেও আয় করা যায়।' কীভাবে? এ প্রশ্নে একজন বলেন ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তার স্কুলে পাঁচজন নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেরা পাঁচজন নির্বাচিতও হন। কিন্তু একটি শক্তিশালী চক্র নিয়োগ দেবে বলে ঘুষ নিয়েছে অন্তত ২০ জনের কাছ থেকে। যারা নির্বাচিত হননি, তারা ঘুষের টাকা ফেরত চাইছেন। ওই চক্র তাতে একটুও বিব্রত নয়। তারা নির্বাচিত পাঁচজনকে ডেকে জানিয়ে দেয়– আমরা অন্য যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, সেটা ফেরত দিতে হবে। আর সেটা আপনাদেরই দিতে হবে। অন্যথায় স্কুলে যোগ দিতে পারবেন না। আমরা সেটা করতে দেব না।

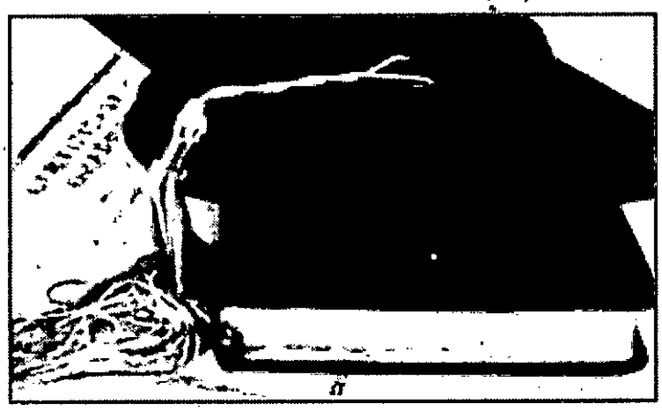

> গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর পেছনে রয়েছেন উঠতি ধনবান শ্রেণী। তারা নিজেরা টাকা খাটাচ্ছেন, প্রভাবশালী রাজনীতিকদেরও যুক্ত করছেন, যাতে প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন সহজে মেলে। কিন্তু এ অভিযোগ কি করা যায় না যে, আমাদের ধনবান শ্রেণী নিজের স্বার্থ বোঝে না? এটাও কি বলা যায় না যে, তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে?

বাংলাদেশের অনেক স্কুল-কলেজেই তো এখন এ অবস্থা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের অনেক সংসদ সদস্য এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারাও এটা করছেন। তারা মনে করেন, এটা তাদের অধিকার। শিক্ষক নিয়োগ কমিশন যাদের উপজেলাভিত্তিক মনোনীত করবে, তাদের স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি সাফ জানিয়ে দেবে– আগে কড়ি ফেলুন, নইলে কী করে এখানে চাকরি করেন দেখিয়ে দেব। এমন নৈরাজ্য সর্বত্র হবে, সেটা বলছি না। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হচ্ছে, তাতে বহু বহু স্থানে এমনটিই হবে।

শিক্ষার মান বাড়াতে হলে শিক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতেই হবে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই এটা হতে হবে। অন্যথায় আমরা উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের পাব; কিন্তু তাদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাব না।

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বড় হচ্ছে, বহুমুখী হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বললে একটি আকুতি শোনা যায়– যোগ্য লোক পাই না। ইন্টারভিউ নিই– মন ভরে না। তারা দক্ষ, উদ্যমী ও চটপটে তরুণ-তরুণীদের নিয়োগ দিতে চান। বাংলাদেশে এদের দেখা কেন মিলবে না? আমরা কেন তাদের তৈরি করতে পারব না? শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্ব রয়েছে এদের গড়ে তোলার। বেসরকারি খাতেরও দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু এ খাতের নেতৃত্বে যারা রয়েছেন তারা কি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছেন? গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর পেছনে রয়েছেন উঠতি ধনবান শ্রেণী। তারা নিজেরা টাকা খাটাচ্ছেন, প্রভাবশালী রাজনীতিকদেরও যুক্ত করছেন, যাতে প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন সহজে মেলে। কিন্তু এ অভিযোগ কি করা যায় না যে, আমাদের ধনবান শ্রেণী নিজের স্বার্থ বোঝে না? এটাও কি বলা যায় না যে, তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে? অনেক অনেক প্রতিষ্ঠানের চাই সেরা মানের উচ্চ শিক্ষিত কর্মী। তারা আসতে পারে সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই অভিযোগ– তারা সার্টিফিকেট বাণিজ্য করছে। তারা পড়াশোনার প্রতি যতটা না মনোযোগী, তার চেয়ে বেশি নজর শিক্ষাকে বাণিজ্যে পরিণত করার প্রতি। তারা অতি উচ্চ হারে বেতন নিচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। পড়াশোনা ভালো হোক না হোক, সেমিস্টার ফি আদায় হলেই হলো। মূল লক্ষ্য বেশি বেশি মুনাফা। কিন্তু আসল নজর তো হওয়ার কথা দেশের জন্য সেরা শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রতি। মুনাফার যূপকাষ্ঠে সবকিছু বলি হয়ে যাবে? যত শিক্ষা তত কান্না নয়– আমরা সত্যিই চাই মেধাবীদের সংখ্যা বাড়তে থাকুক এবং তাদের সবার মিলুক যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ। আর তাতেই দেশ উঠবে হেসে।

ajoydg@gmail.com